বাংলাতেই ধরেছিলেন কোনান ডয়েলের ইংরেজি গদ্যের স্বাদ

অংশুমান ভৌমিক

আনন্দবাজার পত্রিকা,০৯ মে ২০২১ ০৭:১২

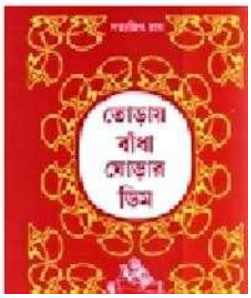

ব্রা নয়, ব্রে। অর্থাৎ ব্রাজিল নয়, ব্রেজিল। দিয়েগো মারাদোনা তখনও জেঁকে বসেননি বাংলার বুকে। ইডেন গার্ডেনসের সবুজ গালচের ওপর খেলতে নামা পেলের পায়ে ছোঁ মেরে বল তুলে নেওয়ার জন্য ঘরের ছেলে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়কে আলাদা চোখে দেখছে বেলেঘাটার পাড়াপড়শি। শনিবারের বিকেলে দূরদর্শনের পর্দায় দেখানো ‘জয়জয়ন্তী’তে ‘ব্রাজিলের পেলে’কে নিয়ে ক্যুইজ টাইম করছেন গভর্নেসবেশী অপর্ণা সেন। তখন সন্দেশের পাতায় বেরিয়েছিল গল্পটা— ‘ব্রেজিলের কালো বাঘ’।

খটকা লেগেছিল। সারা জমানা যেখানে ব্রাজিলের জন্য দিওয়ানা, সেখানে ‘ব্রেজিলের’ লিখতে গেলেন কেন সত্যজিৎ রায়? খবরের কাগজ থেকে শুরু করে খেলার কাগজ, চণ্ডীচরণ দাসের বেস্টসেলার অ্যাটলাস থেকে শুরু করে দেব সাহিত্য কুটিরের বেস্টসেলার ‘ছোটদের বুক অফ নলেজ’ সব জায়গায় ব্রাজিলের মৌরসিপাট্টা, সেখানে ‘ব্রেজিলের’ লিখে দেওয়া মানে ইচ্ছে করে পাঠকসমাজের চেতনায় ধাক্কা দেওয়া। তাতে অ্যাংলোফোন ওয়ার্ল্ডের খবরদারি থেকে নজর ঘুরিয়ে পর্তুগিজ দুনিয়াদারিতে হাত পাকানোর হাতছানিও বুঝি ছিল। ছিল আরও অনেক কিছু।

আশির দশকের গোড়া থেকেই শরীরে জুত নেই সত্যজিতের। আগের মতো সিনেমা তৈরির ধকল নিতে পারছেন না। মন দিয়েছেন লেখালিখি, আঁকাজোকা এবং সম্পাদনায়। ‘সন্দেশ’ তখন নিয়মিত। লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও এক দল একরোখা কর্মীর ওপর ভর দিয়ে মাসে মাসে বেরোচ্ছে। সম্পাদনায় সত্যজিৎ রায়। ‘আনন্দমেলা’র পূজাবার্ষিকীতে একটা করে শঙ্কু-কাহিনি জোগান দেওয়া ছাড়া মূলত ‘সন্দেশ’-এই বেরিয়েছে সত্যজিতের অন্যান্য লেখা। ‘শকুন্তলা কণ্ঠহার’-এর মতো ব্যতিক্রম ছাড়া ফেলুদার গোয়েন্দাগিরির যতেক আখ্যানও। যাঁর আদলে ফেলুদাকে গড়েপিটে নিয়েছিলেন, সেই শার্লক হোমসের স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েলের গল্পের পোকা ছিলেন সত্যজিৎ। তাঁরই ‘দ্য স্টোরি অব দ্য ব্রেজিলিয়ান ক্যাট’ ছিল ‘ব্রেজিলের কালো বাঘ’-এর উৎস। মূল গল্পটা বেরিয়েছিল ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ‘দ্য স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন’-এ। সত্যজিৎ বাংলা করলেন আশির দশকের মাঝামাঝি।

মনে রাখা ভাল যে, অনুবাদ বড় একটা করেননি সত্যজিৎ। কালচারাল ট্রানস্লেশনের জবরদস্ত নমুনা ‘মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প’ বাদ দিলে যেটুকু করেছেন বিলেতের লেখালিখি থেকেই। এডওয়ার্ড লিয়র, লুই ক্যারলের ননসেন্স রাইমকে বাংলায় চালান করে ‘তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম’ অনেকের মনে থাকবে। মসুয়ার রায়চৌধুরী পরিবারের পছন্দসই বাগ্‌ধারার

মধ্যে ‘ঘোড়ার ডিম’ সামনের সারিতে। ননসেন্সের বাংলা হিসেবে ‘ঘোড়ার ডিম’ যাকে বলে তাকলাগানো তর্জমা। ‘তোড়া’ আর ‘ঘোড়া’র জোড়কলম তো আরও মোক্ষম। ওই বইয়েই ‘পাপাঙ্গুল’-এর মতো আজব লিমেরিক ছিল। তাতে ‘ও টিমবালো, হাউ হ্যাপি উই আর’ থেকে ‘আহা, অলম্বুশ!/ আজকে মোদের মেজাজ বড় খুশ্!’-এর মতো আশ্চর্য অভিযোজন ঘটিয়েছিলেন সত্যজিৎ। ইতালির ভাপা পদ মুখ লুকিয়েছিল মহাভারতের রাক্ষসের পেছনে। কিংবা ‘স্টিলটন চিজ়’-এর বাংলা খুঁজতে গিয়ে টুক করে তুলতুলে নরম ‘ঢাকাই বাখরখানি’ আমদানি করেছিলেন। পাঠকের জিভ সুড়সুড় করেছিল ঠিক। ‘দেয়ার ওয়জ অ্যান ওল্ড ম্যান উইথ আ বেয়ার্ড’-এর অনুবাদে ল্যাজামুড়োর অদলবদল করতে দ্বিধা করেননি সত্যজিৎ। হুতোমপ্যাঁচা আর হাঁড়িচাঁচাকে দাড়িবুড়োর সংসারে এনে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই সব অনুবাদ আসল লেখার কাছে নতজানু নয়। বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে একেবারে মৌলিকের পঙ্‌ক্তিতে। কিন্তু গদ্যের অনুবাদ করতে বসে তাঁর সংযম লক্ষণীয়।

‘ব্রেজিলের কালো বাঘ’ এই ধারার সেরা কাজ। বহুল সমাদৃতও। তিনি বেঁচে থাকতেই ১৯৮৭ সালে আনন্দ থেকে বই হয়ে বেরিয়েছিল এই ধাঁচের কয়েকটা গল্প। নাম দিয়েছিলেন ‘ব্রেজিলের কালো বাঘ ও অন্যান্য’। তাতে তিনটে গল্পই ছিল আর্থার কোনান ডয়েলের (সত্যজিৎ লিখতেন ‘কনান’)। বাকি দুটো আর্থার সি ক্লার্ক আর রে ব্র্যাডবেরির। এঁদের মধ্যে ক্লার্কের সঙ্গে তো যাটের দশকে পত্রমিতালি হয়েছিল সত্যজিতের। তাঁর গল্প থেকে ‘দ্য এলিয়েন’-এর চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সত্যজিৎ। আর রে ব্র্যাডবেরির কল্পবিজ্ঞানের গপ্পো ফাঁদার কায়দা সত্যজিতের ঘরের জিনিস। অনুবাদে কিন্তু যথেচ্ছাচার নেই। দাদু কুলদারঞ্জনের দেখানো রাস্তায় চলে একেবারে কেতাবি ধাঁচের তরজমা, অথচ স্বাতন্ত্র্যে ঝলমলে। অনুবাদক সত্যজিতের কৃৎকৌশল বোঝার জন্য এই লেখাগুলোকে তলিয়ে দেখা দরকার।

‘ব্রেজিলের কালো বাঘ’-এ গল্পটা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের? ‘মেজাজটা বনেদী, প্রত্যাশা অসীম, অভিজাত বংশের রক্ত বইছে ধমনীতে,

অথচ পকেটে পয়সা নেই, রোজগারের কোন রাস্তা নেই—একজন যুবকের পক্ষে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কী হতে পারে?' এই কথাগুলো দিয়ে যে গল্প শুরু, তার নানা বিন্যাস ও সমাবেশ ঘটেছে ওই আমলের ব্রিটিশ ক্রাইম ফিকশনে। খতিয়ে দেখলে ফেলুদার বেশির ভাগ গল্পের খাঁচাটা কতক একই রকমের। উনিশ শতকের ইংল্যান্ড। সাদারটনের পেল্লায় জমিদারি এস্টেটের দুই ছোট জমিদারের এক জন পড়ে আছেন লন্ডনে। করেকম্মে খেতে পারেননি। ধারকর্জ যা করেছেন তাতে দেউলে হওয়ার পনেরো আনা বন্দোবস্ত সারা। চোদ্দো পুরুষের জমানো অতুল বৈভবের বখরার দিকে তীর্থের কাকের মতো চেয়ে আছেন বেচারি। নাম মার্শাল কিং। আর এক জন এভারার্ড কিং। ব্রেজিল থেকে ফিরে ছোট একটা জমিদারি কিনে গুছিয়ে বসেছেন তিনি। কী মনে করে মার্শাল ভায়াকে নেমন্তন্ন করে ডেকে পাঠিয়েছেন শহর দূরে অজ পাড়াগাঁয়ে তার গ্রেল্যান্ডসের ডেরায়। সেই ডেরায় এক আজব চিড়িয়াখানা আছে। চিড়িয়াখানার সেরা জিনিস হল আঠেরো ফুট লম্বা এক জাঁদরেল জানোয়ার। ডয়েলের গল্পে তার নাম ব্রেজিলিয়ান ক্যাট। কেউ কেউ একে বলে প্যুমা। রিও নিগ্রো নদীর ধারে এক আদিম অরণ্য থেকে এটাকে খরিদ করে এনেছেন এভারার্ড। এটাই সেই ব্রেজিলের কালো বাঘ। ইউরোপে ঢুঁড়ে এমন 'শয়তান, রক্তপিপাসু জানোয়ার' দুটো পাওয়া যাবে না। এভারার্ডের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে এই বাঘের খাঁচায় আটকা পড়ে কী করে বেঁচে ফিরলেন মার্শাল তার রোমহর্ষক বৃত্তান্ত এই গল্পের জান। আশির দশকের মধ্যে বেশ কিছু জিম করবেট পড়ে ফেলেছে বাঙালি। ইংরিজি কিংবা বাংলায় কয়েক রকমের মানুষখেকোর চালচলন জেনেছে। খোদ সত্যজিতের 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' গুলে খেয়েছে। তবু নতুন লেগেছিল 'ব্রেজিলের কালো বাঘ'। এই ভাল-লাগার মূলে ছিল তরজমার কারিকুরি।

ষোলো আনা ব্রিটিশ ঘরানার এই গল্পগুলো এর আগে কেউ বাংলা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অবাক হয়ে দেখি, সত্যজিৎ বাংলা করতে বসে আক্ষরিক অনুবাদের রাস্তায় গেলেন। কোথাও কাটছাঁটের বালাই নেই। ডয়েলের ইংরিজিকে গুরুবাক্য মেনে এগনো। নিজের আটপৌরে বাংলাকে

পাশে সরিয়ে রেখে, ছোট ছোট বাক্য রচনাবিধির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে। নেহাত বাধ্য না হলে ডয়েলের লেখার যৌগিক ও জটিল বাক্যের ঘনঘটাকেও শিরোধার্য করেছেন সত্যজিৎ। ইংরিজি-বাংলার বাক্যনির্মাণের প্রকরণ এক রকম নয়। শুধু সমাপিকা ক্রিয়ার আগুপিছু নয়, কথার পর কথা জুড়ে চলা বা বাক্যাংশের পর বাক্যাংশ জুড়ে এগোনো ইংরিজিতে যত সহজে হয়, ইংরিজির হাত ধরে বেড়ে উঠলেও বাংলা গদ্যে অতটা হয় না। তবু হাল ছাড়েননি সত্যজিৎ। তাঁর কলমে সহজাত ঝরঝরে তরতরে গদ্যকে সরিয়ে রেখে একটু সেকেলে চলনের গদ্যকে ফিরিয়ে এনেছেন। একশো বছরের তফাত মোছার চেষ্টা না করে ওই একশো বছর আগেকার মেজাজকে ধরতে চেয়েছেন মোটের ওপর তৎসম শব্দে সাজানো ভারিক্কি চালের গদ্যে। সেকেলেপনার এই ঐচ্ছিক নির্বাচন যাতে একেলে পাঠকের পছন্দসই হয় তার জন্য চেষ্টার কসুর করেননি। দু'-একটা জায়গা ছাড়া ওই চেষ্টার ছাপ নেই গল্পে। উনিশ শতকের ইংরিজি গদ্য থেকে 'আই কুড নট বিলিভ মাই ইয়ার্স'-এর মতো অগুনতি বাগধারা বাংলাতে চলে এসেছে। ডয়েলের গদ্যে এ সবের ছড়াছড়ি বলে সত্যজিতের একটু সুবিধে হয়েছে। তার ওপর সহজ কথা সহজে বলার মুন্সিয়ানা তো আছেই! এমন অনুবাদ পড়তে পড়তে স্থান-কাল-পাত্রের হুঁশ থাকে না। মনে হয় বাংলাতে ইংরিজি পড়ছি। মূলের প্রতি এতটাই বিশ্বস্ত সত্যজিতের অনুবাদ যে, সোর্স ল্যাঙ্গোয়েজ-টার্গেট ল্যাঙ্গোয়েজের আড়াআড়ি নেই বললেই চলে। কলমের জোর থাকলে সত্যজিতের লেখা থেকে ডয়েলের ইংরিজিতেও ফিরে যেতে পারেন কেউ। অনায়াসে।

তা বলে কি চলতি বাংলার মুচমুচে আস্বাদ নেই? আলবাত আছে! যেমন ধরুন, লর্ড সাদারটনের ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ডয়েল লিখেছিলেন, 'এগজ্যাক্টলি— আ ক্রিকিং হিঞ্জ, ইফ এভার দেয়ার ওয়জ ওয়ান।' মানবদেহের কলকব্জা নিয়ে এ ধরনের চিত্রকল্প বাংলায় চালু নেই। ক্যাঁচকোঁচ-জাতের লব্জ লিখলে ধ্বন্যাত্মক গুণ বহাল থাকে বটে, মজাটা মিলিয়ে যায়। একটুও না দমে সত্যজিৎ লিখলেন, 'হুঁ... তাও ট্যাঙস ট্যাঙস করে চালিয়ে যাচ্ছে।' দু'-দুটো ভাষাবিশ্বের ওপর কতখানি দখল থাকলে বেহাল তবিয়ত নিয়ে এহেন

বাহাদুরি তর্জমায় এনে ফেলা যায়, তা বাঘা অনুবাদকরা হাড়ে হাড়ে বোঝেন।

ওস্তাদের মার কী আর সাধে বলে!

Reference:

https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/satyajit-rays-success-as-a-translator/cid/1280091